১২-১০-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পতিত দুনিয়া থেকে নিজেদের বুদ্ধিযোগকে সরিয়ে রেখে, বেহদের সন্ন্যাসী হতে হবে তোমাদের। সন্ন্যাসী হওয়া মানে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা পালন করা এবং স্থির সংকল্পের যোগী হওয়া"

প্রশ্ন :- কোন্ অবস্থায় পৌঁছোতে পারলে মায়ার তুফান আর আসে না ?

উত্তর :- আমার পতি, আমার বাচ্চা ..... ইত্যাদি, ইত্যাদি ..... - এই 'আমার আমার' ভাব থাকলে বুদ্ধির যোগ বিছিন্ন হয়ে যাবে। যখন এই ভাব থাকবে- আমার তো কেবল এই একমাত্র শিববাবাই সবকিছু, বাবা ছাড়া আর অন্য কোনও ভাব নাই, আর তা দৃঢ়ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারলেই, বুদ্ধির সংকল্প স্থির ও পাকা হয়। এক ও একমাত্র বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধিযোগে রাখতে পারলে তবেই মায়ার তুফান সমাপ্ত হয়ে যায়।

গীত :- কে এল রে এই প্রভাতে
. আমার মনের দুয়ারে ?

ওঁম্ শান্তি! ভগবান বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতেই পেরেছো যে, সকল আত্মাদেরই এক ও একমাত্র পিতা, যাকে বলা হয় পরম পিতা, পরমাত্মা। সেই বাবা স্বয়ং তোমাদের বলছেন - "আমি কিন্তু আকারে বড় নই মোটেই। তোমাদের আত্মা যেমন অতি ক্ষুদ্র তারা আকারের, যে কপালের দুই ভ্রুকুটির মধ্যে অবস্থান করে, আমি পরম্ আত্মা-ও ঠিক তেমনই। পার্থক্য কেবল আমার গুণ ও মহিমা অনেক অনেক বেশী। তার সাথে আমি আবার জ্ঞানেরও সাগর। অথচ আত্মা এতই ক্ষুদ্র - যার চিত্রাঙ্কণও করা যায় না। আর যদি তা বড় আকারেরই হতো, তবে কিন্তু সে এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশই করতে পারতো না। অথচ শিবলিঙ্গের পূজা করার সময় মানুষ তাকে কত বিশাল আকারের বানিয়ে থাকে। এমন কি তারা একথাও বলে যে, তাঁর আকৃতি অনেকটা বুড়ো আঙ্গুলের মতন। আত্মার অর্থ তো কেবল আত্মাই। পার্থক্য কেবল এইটুকুই - যিনি বাবা তিনি পরমাত্মা, পরমধাম নিবাসী।" বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা আসুরী দুনিয়া। যা কেবল আসুরী সম্প্রদায়ের উপযুক্ত। কিন্তু যখন সত্যযুগ ছিল, এই ভারতই তখন দেবতাদের রাজ্য ছিল যা এখন তা আসুরী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। একবার লক্ষ্য করো, মানুষ কি কি খাদ্য খায়! মাংস, মদ - এসব অখাদ্য তো রাক্ষসদের আহার। এই সামান্য কথাটাও তারা বোঝে না। স্কুলগুলিতেও এমনই শিক্ষা দেওয়া হয়। তারই মধ্যে কারও খুব ভাল চিন্তাধারা, কারও চিন্তাধারা রজোগুণী আবার কারও বা তমোগুণী হয়। আবার যে অন্যদেরকে সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারে না তাকে সবাই বোকা বলে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যেও তেমনি ক্রমানুসার আছে। যেমন, মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং এমনও বহু আছে, যারা ভালভাবে অন্যদেরকে বোঝাতেই পারে না। জ্ঞানকে সঠিক ভাবে ধারণ না করার কারণে অনেকেই (ডিস্-সার্ভিস) হানিকারকও হয়ে পড়ে। আসলে যার যতটা জ্ঞানের পরিধি, সে তো ততটাই বোঝাতে পারবে। এটাও আবার হয় ক্রম-অনুসারেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা আবার ভুলও করে বসে। বাচ্চারা, অতএব তোমাদের মধ্যে উদ্যম-উৎসাহের ফুর্তি থাকা দরকার - যেহেতু আগামীতে তোমরাই দেবতায় পরিগণিত হতে

যাচ্ছো। বাবা নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "আমিও তো এই পতিত দুনিয়াতেই এসেছি।" সত্যযুগে এই ব্রহ্মাবাবাই নারায়ণের রূপে ছিলেন, তাইত তো আমি এখন এনারই শরীরে প্রবেশ করেছি। প্রতি কল্পেই এনাকেই আমি নর থেকে নারায়ণ বানিয়ে থাকি। সত্যযুগে নম্বর ওয়ান পূজ্য ইনিই ছিলেন। আবার পরে নম্বর ওয়ান পূজারীও ইনি। এরপরে আবার এনারই অল-রাউণ্ডার (সর্ব প্রকারের) পার্ট রয়েছে। আর ওনার এই শরীরটা যে আমার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। যার কোনও পরিবর্তন ঘটানোও সম্ভব নয়। এমনও করা যায় না যে, অন্য কোনও সময় আবার অন্য কারওকে এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই অবিনাশী ড্রামায় আগে থেকেই সবকিছু নির্ধারিত থাকে। যার কোনও কিছুই পরিবর্তন করা যায় না।

বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, "আমিও তো আসি এই পতিত দুনিয়াতেই। তোমরা যদি কারওকে পতিত বলো- সে কিন্তু তক্ষুণি ক্ষেপে যাবে। আবার যদি এভাবে বলো- ভগবান বলছেন যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো আসুরী সম্প্রদায়ের, তখন কিন্তু তা মেনে নেবে। ভগবানের অর্থ - নিরাকার ভগবান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর বা কৃষ্ণ কেউ-ই ভগবান নয়। বাবা বলছেন, যদিও আমি পরমাত্মা, আমিও কিন্তু তোমাদের মতনই আত্মা। তোমাদের রাজযোগ শেখাবার জন্যই আমি এসেছি। যেই যোগের এত মহিমা। যদিও দুনিয়ায় অনেক প্রকার যোগের আশ্রমও খোলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। একমাত্র তোমরা বি.কে-রাই এই রাজযোগের শক্তিতে সমগ্র দুনিয়াকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাতে পারো।

তোমরা বি.কে-রাই এই বিশ্বের পরিবর্তন আনতে পারো। বিশ্বের সবাই তো আর এই রাজযোগের আসনে বসবে না। যেহেতু তারা এর মহিমাটুকুও জানে না। তারা তো এও জানে না যে, এই বিশেষ রাজযোগের দ্বারা ভারত ভূখণ্ডই সেই স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। এমন কি, তাদের এটাও জানা নেই যে, ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য কে বা কারা বানায়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্য বানাবার কারিগর কেউ না কেউ তো আছে অবশ্যই। সে কথাই বাবাও বলছেন, "একমাত্র আমিই এসে তোমাদেরকে সেই দেবতা হবার কর্ম-কাণ্ড শিখিয়ে থাকি। যদিও তা খুবই সহজ পন্থায়। অথচ, জাগতিক লোকেরা তো কত জাঁক-জমক সহযোগে যজ্ঞাদিও করে থাকে। কিন্তু এখানে তোমাদের আগুন জ্বালিয়ে সেসব যজ্ঞাদি করতে হয় কি ? একমাত্র ধূপকাঠি জ্বালাতে হয়, তাও সুগন্ধ ছড়াবার জন্য। এছাড়া অন্য কোনও কর্ম-কাণ্ডের রীতি-নীতির বালাই নেই এখানে।" বাবা স্বয়ং নিজেকে আত্মা বলেই ওনার পরিচয় দেন - যেমন আমরাও আত্মা। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, উঁনি পুনর্জন্মের নিয়মে পড়েন না। যদিও অবতরণের মাধ্যমে ওনার জন্ম হয়, কিন্তু মৃত্যু বলে কিছু নেই ওনার ক্ষেত্রে। তাই তো লোকেরা কেবল ওনার জন্ম-জয়ন্তীটুকুই পালন করে। একমাত্র উঁনি এই ব্রহ্মার শরীরেই আসতে এবং যেতে পারেন, আর তা করেন কেবলমাত্র বি.কে. বাচ্চাদেরকে পাঠ পড়ানোর উদ্দ্যেশ্যে। অতএব একে মৃত্যু আখ্যা দেওয়া যায় না। উঁনি আসেনই ওনার (বি.কে.) বাচ্চাদেরকে দেবতা বানাবার লক্ষ্যে। আর তা নির্ভর করে, কে বা কারা নিজেরা এসে আগ্রহভরে সেই পাঠ গ্রহন করবে- তার উপর। আর এই পাঠ কেবল তারাই পড়বে, কল্প পূর্বেও যারা এই পাঠ পড়েছিল। অনেক কাল ধরে বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তোমরাই সেই হারানিধি বাচ্চারা। অন্যেরা তো আর ৮৪-জন্ম পায় না। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই সম্পূর্ণ কল্প ধরে এই ৮৪-জন্মের পার্ট পাও। জগতের (নির্বোধ) লোকেরা এত বেশী জন্ম নিতে হয়রানি বোধ করে। উপরন্তু তারা তোমাদেরকেও এই উপদেশ দেবে, যাতে তোমরা এই ৮৪-জন্মের চক্রে না আসো। যাই হোক, তোমরা যেমন শক্তিশালী - তেমনই সাহসী- তাই এতেই

তোমাদের আনন্দ। এই ৮৪-জন্মর চক্রকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা সমগ্র বিশ্বের চক্রবর্তী রাজায় পরিণত হও। লোকেদের পতাকাতেও চক্রকে দেখানো হয়, কিন্তু পরে আবার সেটাকেই চরকার রূপ করে দিয়েছে। তাদের প্রতীক চিহ্নের তুলনায় তোমাদের প্রতীক চিহ্নটাই সঠিক। একেবারে শীর্ষে শিববাবা, তার নীচে ত্রিমূর্তি, আর চক্রও রয়েছে তার সঠিক স্থানেই। তোমাদের এই শিবের পতাকা একেবারেই সঠিক।

বাচ্চারা, ইতিপূর্বে তোমাদের বোঝানো হয়েছে - সন্ন্যাস দুই প্রকারের। একটি হল নিবৃত্তি মার্গের, অর্থাৎ যারা গৃহস্থালী-সংসার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়, যাদের অর্দ্ধ-সন্ন্যাসী বলা চলে। আর তোমরা হলে পূর্ণ সন্ন্যাসী। কিন্তু তা কিসের ? - যেহেতু এই দুনিয়াতে থেকেই সমগ্র আসুরী দুনিয়াদারীকে ত্যাগ করো তোমরা। "আমার পতি, আমার সন্তান, আমার গুরু এসবকিছুর মোহ থেকে তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগকে দূরে সরিয়ে রাখো। তোমাদের বুদ্ধির যোগ থাকে কেবলমাত্র এই একটি ব্যাপারেই -"আমার তো আছে শুধুমাত্র এক শিববাবা, আর কিছুই নয় আমার।" যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থায় না আসবে, ততদিন পর্যন্ত মায়ার তুফান আসতেই থাকবে আর তোমরাও নানান অস্থিরতায় ভুগতে থাকবে। এই কারণেই বাবা এই আসুরী দুনিয়া থেকে তোমাদের সন্ন্যাস করান। এছাড়া এসবই তো অচিরেই ভস্মে পরিণত হবে। জগতের লোকেরা কিন্তু এভাবে বলতে বলতে পারে না- সবকিছুই ভস্মে পরিণত হবে। যদিও তোমরা আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যেই থাকো, কিন্তু তাদের দেখাশোনা ও কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে তোমাদের বুদ্ধির যোগ কিন্তু সেই পরমাত্মার সাথেই যোগযুক্ত থাকে। যেখানে আমার বলতে কিছুই নয় আমার। আর এই ভাব থাকলে সেখানে কাম-ক্রোধ কিছুই আসবে না ! এই সুন্দর যুক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে হয়। কিন্তু তা তো প্রথমে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। একেই রাজযোগ বলা হয়। যোগযুক্ত হতে পারলে তবেই রাজ্য-ভাগ্য পদের প্রাপ্তি হয়। অন্যদের যোগ হলো হঠ-যোগ। এটাই সবচেয়ে গুহ্য পয়েন্ট। এত বিশাল দুনিয়াতে যোগী তো অনেক আছে। কিন্তু তাদের কাররই বাবার সাথে যোগের সম্বন্ধ ঘটে না - এ কথা স্বয়ং বাবা জানাচ্ছেন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, ওনার সাথে যোগযুক্ত হবার পরিবর্তে ওঁনার নিবাস স্থান পরমধাম আর ব্রহ্মতত্বের সাথে যোগযুক্ত হয় তারা। যেমন ভাবে ভারতবাসীরা নিজেদের নিবাস স্থান হিন্দুস্থানকেই নিজেদের ধর্ম মেনে নিয়েছে। ঠিক তেমন ভাবেই তারা নিজেদেরকেও ব্রহ্মার বাচ্চা হিসাবে ভেবে থাকে। যদিও প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদেরকে ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে ভাবতেই পারে না। সন্তান হলে তো সেক্ষেত্রে বাবার সবকিছুর অধিকারীও হবে। তারা আবার এ কথাও বলে যে, তারা সেই ব্রহ্ম-তত্বে লীন (মিশে) হয়ে যাবে। বাবার তো সবকিছুরই অভিজ্ঞতা আছে। ব্রহ্মাবাবারও এমন অনেক সন্ন্যাসী, অনেক গুরুর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। জগতের লোকেরা চিত্রের সাহায্যে এমন ভাবের প্রকাশ দেখায় যে, মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেরও অনেক গুরু ছিল। আসলে তোমরা সবাই এক একজন অর্জুন। বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব। পুরো দুনিয়াটাই এখন লঙ্কা-রাজ্য। যা কোনও একটা দ্বীপ-রাষ্ট্রের লঙ্কা-রাজ্য নয়। দ্বীপ লঙ্কা-রাজ্য তো হদের। কিন্তু বেহদের লঙ্কা-রাজ্য তো সমগ্র দুনিয়াটাই। এখন সমগ্র হদের দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব চলছে। রামের রাজত্বকালে এত বিশাল সংখ্যক মানুষও থাকে না। আবার যখন রামরাজ্য থাকে, তখন রাবণের রাজ্য থাকে না। তবে এই রাবণের রাজ্য তখন যায় কোথায় ? --তখন তা নীচে অর্থাৎ পাতালে চলে যায়। ঠিক তেমনই রাবণ রাজ্য শুরু হলেও রামরাজ্যও নীচে চলে যায়। এটাই এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট। কল্পের-চক্র ঘুরতে ঘুরতে একসময় সত্যযুগ উপরে উঠে আসে। দ্বাপর ও কলিযুগ তখন নীচে চলে যায়। এভাবেই সত্যযুগ আর ত্রেতাও নীচে থেকে উপরে উঠে আসে। এসবই কল্প-

চক্রের চিত্রপটের ব্যাপার। শাস্ত্রকারেরা তা এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। অথচ প্রকৃত অর্থে তা কোনও সাগরের তলায় চলে যায় না কিম্বা তা কোনও সাগর থেকেও উঠে আসে না।

বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন - তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট একাগ্রতা থাকতে হবে এসব গুহ্য (গভীর) রহস্যগুলি অনুধাবন করারর জন্য। যার জন্য প্রথমতঃ তোমাকে হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র ও যথেষ্ট শক্তিশালী যোগী। তবেই তোমাকে বলা যাবে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী। আর তা এমন হতে হবে, এই দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়ার কোনো-প্রকারের বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণও থাকবে না মন-বুদ্ধিতে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও এই কথার প্রকৃত অর্থ মাত্র কয়েকজনই সেভাবে বুঝতে পারবে। সবাই তা বুঝতে পারলে তো জ্ঞানের-গঙ্গাই বইতে থাকবে। আর তাই তো তোমাদের মধ্যে কেউ বা ছোট নদী, কেউ বা খালের মতো হও। তবে তোমরা যদি পুকুরের মতন হয়ে নিজেদের ঘরেই ঠিক মতন বোঝাতে পারো, তবুও ভাববো তোমরা কিছুটা অন্ততঃ বুঝতে পেরেছো। কিন্তু তোমাদের বেশীর ভাগই তো নিজেদের ঘরেই সেভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারো না। বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের আর্থিক সঙ্গতি যতই খারাপ থাকুক না কেন, তবুও নিজের ঘরেই ছোট হলেও গীতা-পাঠশালা খুলতে পারো। যদি কেবলমাত্র একটাই ঘর থাকে, যেখানে তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম-শোয়া সবকিছুই করতে হয়। তবুও ইচ্ছা থাকলে উপায় ঠিকই হয়ে যাবে। জিনিষ পত্র সব এক কোণে গুছিয়ে রেখে, ঘর পরিস্কার করে তারপর ক্লাসের জায়গা বানিয়ে ক্লাস শুরু করতে পারো। তিন-গজ জমিনেও তোমরা এই বিখ্যাত হাসপাতালও খুলতে পারো। ধনীদের কথা ছাড়ো। তোমাদের এই বাবা তো দীনের বন্ধু। সম্পদশালীরা তো ভাবে, এই দুনিয়াটাই তাদের কাছে স্বর্গ। বাবা তখন বলেন- ঠিক আছে, তবে তোমরা তোমাদের এই স্বর্গেই খুশীতে থাকো। তবে আর কি বা দেবার আছে আমার! দান তো গরীবদেরই দেওয়া হয়। তেমন ধনীরা তো এখানে মাটিতে বসতেই সঙ্কোচ বোধ করো। তাই বাবা-ও তাদেরকে তাদের নিজেদের মহলেই থাকতে বলেন। বাবা বলছেন, গরীবেরাই আমার কাছে আসে এবং তারা খুব মনোযোগ সহকারেই এই পাঠ পড়ে।

তোমরা যদি অন্যদেরকে সঠিক ভাবে এই জ্ঞান শোনাতে না পারো, তবে তো তোমাদেরকে ছোট পুকুরও বলা যাবে না। যেখানে তোমাদের বড় নদী হতে হবে। তাই সেভাবে মাম্মা আর ব্রহ্মাবাবাকে অনুসরণ করতে হবে তোমাদের। আর যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই ঠিকমতন বোঝাতে না পারো, তবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে 'হাতের তালুর এক আঁজলা জল'-এর সঙ্গেই তুলনা করতে হবে। বাবা আনন্দ পান জ্ঞান-গঙ্গা বাচ্চাদেরকে সামনে পেলে। যারা বাবার সামনে বসে শোনার সুযোগ পান, তারাও তেমনি আনন্দ পায়। কিন্তু যেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করে, তাদের সেই আনন্দের ঘোরও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এরপর নিজেদের ঘরে পৌঁছোলে তো পরনিন্দা-পরচর্চা বা খোশগল্পই শুরু হয়ে যায়। এইসব বাচ্চাদের চাল-চলন ও ব্যাবহারেই বাবা সবকিছুই বুঝতে পারেন। এদের অনেকেই আবার কেবলমাত্র তার পতি ও সন্তানের কথা জানাতেই বাবার কাছে আসে সাক্ষ্যাৎ করতে। -- আরে, এসব জ্ঞানের পাঠের মধ্যে তোমার পতি আবার এলো কোত্থেকে ? তোমরা এখানে আসো তো স্বর্গ-রাজ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে - সেখানে আবার মন-বুদ্ধিতে আমার আমার ভাবে ফেঁসে থাকবে কেন ? আচ্ছা, আজকের মতো এটুকু ডোজ-ই (dose: ঔষধের মাত্রা) যথেষ্ট। মাত্রা ততটাই দেওয়া উচিত যতটা হজম করতে পারবে। বাবা তো কেবল বাদামের খোসাটারই বর্ননা করেছেন .....! যোগ-অগ্নির দ্বারা তো তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করছো- কিন্তু রাজত্ব চালাবার জন্য তো জ্ঞানেরও প্রয়োজন। জ্ঞান ও যোগ - দুটোই প্রধান বিষয়। বাবাও

স্বয়ং যোগে থাকার পুরুষার্থ করেন, তাই তো উনি বলেন- না বিসরো - না য়াঁদ রহো। অর্থাৎ শিববাবা বলেন -"বাচ্চারা সদা খুশীতে থাকো। আনন্দ সহকারে বাবাকে স্মরণ করবে। তবে বাবাও বাচ্চাকে ভুলতে পারবে না। আর না তো কেবল নাম-রূপে বাবাকে স্মরণে রাখবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদর স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস নিতে হবে নিজেকে। পবিত্রতা আর যোগ বিষয়ের উপর প্রথম স্থান অধিকার করতে হবে।

২) স্বয়ং জ্ঞানের গঙ্গা হয়ে পতিতদেরকেও পবিত্র বানাবার সেবা করতে হবে। মাম্মা আর বাবাকে এভাবে অনুসরণ করতে হবে, যেন তোমরা হয়ে ওঠো বড় নদীর তুলনীয়।

বরদান :- সময়ের জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে, সজাগ হয়ে, সব প্রশ্নগুলিকে সমাপ্ত করে স্বদর্শণ চক্রধারী হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা স্বদর্শণ চক্রধারী হয়ে নিজেকে দর্শণ করতে পারে স্বতঃতই সৃষ্টি-চক্রও তার দর্শণ হয়ে যায়। অবিনাশী ড্রামার রহস্যগুলিকে জানতে পেরে সে সদা খুশীতে থাকে। কেন, কি, এসব কোনও প্রশ্নই আসে না তার মনে। যেহেতু সে স্বয়ং এই কল্যানকারী ড্রামার একজন অভিনয়কারী এবং এই ড্রামার বর্তমান সময়টাও কল্যাণকারী। যে নিজেকে দেখতে পারে, অর্থাৎ স্বদর্শণ চক্রধারী হতে পারে, সে সহজেই সম্মুখ পানে এগোতে থাকে।

স্লোগান :- অনেক বেশী আত্মাদেরকে প্রকৃত সেবা করার আগ্রহ থাকলে শুভ-চিন্তক হও।

. :: মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য ::

১) "ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী নয়, তার অনেক প্রমাণাদিও আছে "
শিরোমণী গীতাতে শাস্ত্রকারেরা যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন - ভগবান স্বয়ং বলছেন : "ওহে বাচ্চারা, জয় যেখানে - আমিও সেখানে"; - এ তো স্বয়ং পরমাত্মারই মহাবাক্য। যেমন উদাহরণ স্বরূপে উনি বলেছেন- পাহাড়ের মধ্যে হিমালয় পর্বতে ওনার অবস্থান এবং সাপের মধ্যে কালীয় নাগে। বাস্তবে দেখা যায় যে পর্বতের মধ্যে সবচেয়ে উচু পর্বত কৈলাস-পর্বত, এবং সাপের মধ্যে কালীয়-নাগ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পরমাত্মা যদি কেবল সাপের মধ্যেই অবস্থান করতেন, তবে তো সব সাপের মধ্যেই ওনার উপস্থিতি থাকতো, আর তা কেবলমাত্র কালীয়-নাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। আবার দেখা যাচ্ছে, পরমাত্মা কেবলমাত্র সবচেয়ে উচু পর্বতেই অবস্থান করছেন, কিন্তু ছোট পাহাড়গুলিতে নয় কেন ? এছাড়া পরমাত্মা একথাও বলছেন, জয় যেখানে কেবলমাত্র সেখানেই ওনার জন্ম, অর্থাৎ কোনও কিছুতেই হারেন না তিনি। অতএব এই কথাগুলিতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। একদিকে লোকেরা এসব কথা বলে, আবার অন্যত্র তারাই অন্য কথা বলে

জানায় যে, পরমাত্মা অনেক রূপেই বিরাজমান হন। তাই তো তারা (জৈনরা) আবার পরমাত্মার ২৪ রূপের অবতারকেও দেখায়। কচ্ছপ, মৎস্য, ইত্যাদিতেও পরমাত্মার রূপকে বর্ণনা করেন অনেকে। এগুলি সবই ভুল জ্ঞানের প্রকাশ। ঠিক একই ভাবেই লোকেরা পরমাত্মাও সর্বত্র বিরাজমান এমনটাই ভাবে। যেখানে বর্তমানের এই কলিযুগে সর্বত্রই মায়ার ব্যাপক প্রভাব, সেখানে বর্তমানের এই দুনিয়ায় পরমাত্মার ব্যাপকতা থাকবেই বা কি প্রকারে ? গীতাতে আবার এও বর্ণিত আছে যে, যেখানে মায়ার ব্যাপকতা, সেখানে পরমাত্মার ব্যাপকতা নেই। এতেই তো যথেষ্ট রূপে প্রমাণ হয়ে যায়, পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান নয়।

২) "নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ আত্মাদের প্রকৃত বাসস্থান"

একথা আমরা জানি যে, আমরা যখন নিরাকারী দুনিয়া বলি, সেই নিরাকারের অর্থ এমন নয় যে, তার কোনও আকার বা আকৃতি নেই। আমরা যখন বলছি নিরাকারী দুনিয়া, এর অর্থ, সেখানে অবশ্যই কোনও দুনিয়া আছে। যদিও তা কোনও স্থুল সৃষ্টির আকারে নয় অবশ্য। যেমনটা আমাদের এই স্থুল দুনিয়া। যেমন, পরমাত্মা যদিও নিরাকার, তবুও পয়েন্ট অফ লাইটের মতন ওনার সূক্ষ্ম একটা রূপ অবশ্যই আছে। তেমনি আত্মা আর পরমাত্মারও কোনও ধাম আছে। যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আমরা যখন দুনিয়া শব্দটি প্রয়োগ করছি, এর দ্বারাই তো প্রমাণিত হচ্ছে, সেটাও একটা দুনিয়া। সেখানে আত্মারা থাকে বলেই তো তাকেও দুনিয়া বলা হয়। জগতের লোকেরা ভাবে যে, পরমাত্মার রূপও অখণ্ড জ্যোতি তত্ব স্বরূপ। যে তত্বে পরমাত্মার প্রকৃত বাসস্থান। যাকে পরমাত্মার অবসর গ্রহনের স্থান বলা হয়। পরমাত্মার ঘরকে তো আর পরমাত্মা বলা চলে না। এছাড়াও আরও এক আকারী দুনিয়া আছে, যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর দেবতারা সূক্ষ্ম ফরিস্তা আকারী স্বরূপে থাকেন, আর এটা হলো সাকারী দুনিয়া। এর আবার দুটো ভাগ আছে, একটি নির্বিকারী অর্থাৎ স্বর্গের দুনিয়া। যেখানে অর্দ্ধ-কল্প ধরে বিরাজ করে সুখ, পবিত্রতা আর শান্তি। এর দ্বিতীয়টি হলো বিকারী কলিযুগ, যা দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই একটি দুনিয়াকেই দুটো দুনিয়া বলা হয় কেন ? কারণ- মানুষেরাই তো বলে স্বর্গ আর নরক - যা ভগবানের সৃষ্টি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরমাত্মার মহাবাক্য হলো, ওহে বাচ্চারা, কোনও দুঃখের দুনিয়া রচনা করি না আমি। আমি যে দুনিয়ার রচনা করি তা কেবলমাত্র সুখেরই দুনিয়া। কিন্তু বর্তমানের এই যে দুঃখ আর অশান্তির দুনিয়া তার কারণ হলো মনুষ্য আত্মারা নিজেরাই তাদের আত্মিক ভাবটাকে এবং আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তারা নিজেদের কর্মফলের হিসেব-নিকেশ ভোগ করছে। এর অর্থ এই নয় যে, যেই সময়ে দুনিয়াতে সুখ আর পুণ্য থাকে বলে, জাগতিক কোনও কাজ-কর্ম চলে না। তবে হ্যাঁ, একথা অবশ্যই বলা চলে যে, যেহেতু সেই সময়কার দুনিয়ায় দেবতাদের নিবাস থাকায়, সেখানকার সবকিছুই প্রবৃত্তি অনুসারেই চলতে থাকে। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কোনও বিকারী পন্থায় বাচ্চার জন্ম হয় না তখন। আর সেই কারণেই কোনও কর্মবন্ধনও থাকে না। তাই সেই দুনিয়াকে কর্মবন্ধন রহিত স্বর্গের দুনিয়া বলা হয়। তবে নির্যাস হলো গিয়ে - প্রথমটি নিরাকারী দুনিয়া, দ্বিতীয়টি আকারী দুনিয়া আর তৃতীয়টি হলো সাকারী দুনিয়া। আচ্ছা - ওঁম্ শান্তি!